42

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 04 FEB 1996 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ... ২ ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

গবেষকদের স্বার্থ উপেক্ষিত কেন?

যে দেশে অনিয়ম চলতে চলতে অনিয়মই নিয়ম হয়ে দাঁড়ায়, সেখানে নতুন কোন নিয়ম চালু করতে গেলে সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই বেশি হয়। তাছাড়া নতুন নিয়ম যাঁরা চালু করতে চেষ্টা করেন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় সুদূরপ্রসারী ও সুচিন্তিত পরিকল্পনা না থাকায় ক'দিন যেতে না যেতেই চালু করা নতুন নিয়মের দুর্ভোগ এসে চাপে ঘাড়ে। ক্রমে তা রূপ নেয় নিরাময়হীন রোগে।

আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এ বিষয়টি হরহামেশাই ঘটছে। ঘন ঘন সিলেবাস বদল, কখনও ভর্তি পরীক্ষা, কখনও নম্বরের মেধা তালিকা, কখনও টিক চিহ্নের পরীক্ষা, কখনও বড় প্রশ্নের ধকল— সব মিলিয়ে শিক্ষার্থীকে 'এক্সপেরিমেন্টের গিনিপিগ' বানানো হচ্ছে। লাইব্রেরি তথা গ্রন্থাগার হচ্ছে ছাত্র ছাত্রী তথা জাতির মেধা ও মনন বৃদ্ধির পীঠস্থান। এই গ্রন্থাগারে যখন অনিয়মের নতুন নিয়ম চালু করা হয়, তার প্রভাব কতটা গভীর হতে পারে তা বলাই বাহুল্য। আর তা যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে হয়— তো লজ্জায় মাথা নত হওয়াই স্বাভাবিক।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার আমাদের দেশের একটি উল্লেখযোগ্য এবং প্রাচীন গ্রন্থের সংগ্রহশালা নিঃসন্দেহে। এই গ্রন্থাগারে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা কোন বই ইস্যু করতে পারে

সৌরভ সিকদার

না। শুধু বসেই পাঠ করার সুযোগ পায়। এমনকি বই যে স্থানে থাকে তারা সেখানেও গমনের সুযোগ পায় না। ক্যাটালগ দেখে কাঙ্ক্ষিত বইয়ের নম্বর লিখে দিলে কর্তব্যরত কর্মচারীরা তা বের করে দেন। বই পাঠ শেষে তা ফেরত দিয়ে তারপর লাইব্রেরি ত্যাগ করতে পারে। শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, পিএইচডি-এমফিল গবেষকরা নিজ হাতে তাক থেকে বই বেছে নিতে পারতেন। শিক্ষকদের জন্য পদমর্যাদাভিত্তিক দশের অধিক সংখ্যক বই গ্রহণের সুযোগ থাকলেও এমফিল/পিএইচডি'র তরুণ গবেষকদের জন্য এই সংখ্যা মাত্র ৪টিতে সীমিত। অতিসম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এক আদেশ জারির মাধ্যমে এই সংখ্যা ৪ থেকে কমিয়ে ২-এ স্থির করেছে। শুধু এখানেই শেষ নয়, বইগুলো যে সংরক্ষিত এলাকায় থাকে সেখানেও তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যেদেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গবেষণার সুযোগ কম, সেদেশের সর্বাধিক সংখ্যক গবেষকের একমাত্র ভরসা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার। অথচ এই গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ সম্প্রসারণের পরিবর্তে তা আরও সঙ্কুচিত করে দেয়ার অর্থ কিন্তু অন্য কিছুর ইঙ্গিত করে। উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার দ্বার রুদ্ধ করে দেয়ার এই প্রয়াস মেনে নেয়া সত্যি কঠিন। স্বাধীনতার পঁচিশ বছরে পা দিয়ে আমাদের গবেষণা আবিষ্কার যেখানে বাইরের পৃথিবীর দরজায় করাঘাত করবে, সেখানে যখন নিজেদের জ্ঞানের দরজা এঁটে দেয়া হয়, তখন সে সিদ্ধান্তকে লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষের চক্রান্ত বললে সম্ভবত ভুল বলা হয় না।

এ গেল একদিক। অন্যদিকে নতুন করে গ্রন্থভবন সম্প্রসারিত হওয়ায় গ্রন্থাগারে এখন পাঠের স্থান যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, পাশাপাশি বই ও স্থানান্তরিত হয়ে নতুন ভবনে চলে এসেছে। এখানে শুধু কয়েকটি টেবিল-চেয়ারের প্রতিবন্ধকতা দিয়ে পাঠকক্ষ থেকে বইগুলোকে পৃথক করা হয়েছে। পাঠকক্ষের ছাত্ররা এই বইগুলো ইচ্ছামতো টেবিলে নিয়ে আসছে তাক থেকে। কখনও কখনও ছাত্রছাত্রীরা টেবিল-চেয়ারে না বসে ভিড় জমাচ্ছে বইয়ের তাকের পাশে, যদিও এলাকাটি ছাত্রছাত্রীদের জন্য নিষিদ্ধ। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা এখানে অবলীলায় আসা-যাওয়া করছে। কর্তব্যরত একজন কর্মচারী রয়েছে, যার দায়িত্ব ছাত্রছাত্রীরা কল নম্বর দিলে তাক থেকে নির্দিষ্ট বইটি বের করে দেয়া। বাস্তবে কিন্তু তা সম্ভব হচ্ছে না এবং সম্ভব করার কোন চেষ্টা গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের নেই। সে কারণেই হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর জন্য নির্দিষ্ট রাখা হয়েছে মাত্র একজন কর্মচারী। তাই বেশির ভাগ সময়ই নিরুপায় কর্মচারী চেয়ারে বসে ঝিমুতে থাকে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের জন্য

গ্রন্থাগার ব্যবহারের এই নতুন অলিখিত নিয়ম চালু হওয়ায় লাভ যা হয়েছে তা অঙ্কের হিসাবে নিঃসন্দেহে বিশাল। সেটা হচ্ছে আগে গ্রন্থাগারের বইয়ের একটা-দুটো পাতা উধাও হয়ে যেত, এখন আস্ত বইটিই গায়েব হয়ে যাচ্ছে।

এভাবে চলতে থাকলে খুব বেশিদিন লাগবে না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারটি নিঃস্ব হয়ে যেতে। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে বিনা পয়সায় দেয়া বিখ্যাত সানিও কোম্পানির এসিগুলো লাগানোর চেয়ে এখন বেশি প্রয়োজন গ্রন্থের যত্ন এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। বই চুরি বাঁচানো।

তৃতীয় বিশ্বের এই দরিদ্র দেশে গ্রন্থাগারের জন্য বই সংগ্রহ করা যত কঠিন, তার চেয়ে বেশি কঠিন তা সংরক্ষণ করা। এই সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার জন্য যেমন গ্রন্থাগার কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োজিত, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষেরও এ বিষয়ে উন্নয়নমুখী সুস্পষ্ট নীতিমালা থাকা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বলেই একজন ডজনখানেক দুর্লভ গ্রন্থ উঠিয়ে নিজ গৃহে বন্দী করে রাখবেন, আর একজন উৎসুক নবীন গবেষক সে বইয়ের নাগাল তো পাবেনই না, এমনকি তাঁর প্রয়োজনীয় গবেষণাকর্মের জন্য তিনি মাত্র ২টি গ্রন্থ একমাসের জন্য রাখার অনুমতি পাবেন, এ নিশ্চয় কোন যৌক্তিক নীতিমালা হতে পারে না।

লাইব্রেরি হচ্ছে জ্ঞানগৃহ। জ্ঞানগৃহে প্রবেশের দরজা সবার জন্য সমানভাবে উন্মুক্ত থাকা উচিত। বিশেষ করে গবেষকদের জন্য। একজন বড়লোক জ্ঞানপিপাসুর জন্য সারাক্ষণ উন্মুক্ত আর একজন দরিদ্র জ্ঞানপিপাসুর জন্য ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে আটটা-দুটো খোলা রাখার নীতি আর যাই হোক কোন সুস্থ রীতি নয়। ধনী-দরিদ্র সবার জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ করা জাতীয় প্রতিষ্ঠানের একটি নৈতিক জাতীয় দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা আগামী দিনের গবেষক-বুদ্ধিজীবী তৈরির জন্য প্রতিবন্ধক হয়ে থাকবে। এমনিতেই আমরা অনেক পিছিয়ে রয়েছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ, বিষয়টি নিয়ে নতুন করে ভেবে দেখবেন। এইটুকু যদি বিবেচনায় থাকে যে লাইব্রেরি কাদের জন্য, আর বর্তমান ব্যবস্থায় কারা উপকৃত হচ্ছে বই চোর না সত্যিকার গবেষক, তাহলেই চলবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের অহঙ্কারের প্রতিষ্ঠান। এই অহঙ্কার যেন ম্লান না হয়— সেই শুভ বুদ্ধির উদয় হোক।